Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 333 – 337
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

সাহিত্যের আলোকে পঞ্চাশের মন্বন্তর : অশনি সংকেত, মন্বন্তর, নবান্ন

ভাস্কর দত্ত
এমফিল, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : bhaskardutta365@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
1943 famine, Ashani sanket, Mannantar, Nabanno, Socio- economic condition, Health.

Abstract
The British government's final gift to Indians during the colonial period was the 1943 famine which resulted in the deaths of hundreds of thousands of Indians. These Famine destroyed the social, political, economic foundations of Indian civilization. Historians have given a detailed explanation about this famine in their books.

Literature and history are deeply connected with each other. Several Literary works have been created about these Famine. Among these literary works, I have tried to highlight how the history of the famine of 1943 can be found only through Ashani Sanket, Manaantar, and Nabanna.

Discussion
১১৭৬ এবং ১৩৫০- এর মাঝখানে ১৭৪ বছরের ব্যবধানে বাংলায় খুব বেশি স্মরণযোগ্য দুর্ভিক্ষের কথা শোনা যায় না। তবে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা, ১৯৪২ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আগস্ট আন্দোলন, ভারতবর্ষে জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনা এই রকম এক পটভূমিতে ভারতবর্ষ তথা বাংলার বুকে নেমে আসে 'পঞ্চাশের মন্বন্তর'-এর বিভীষিকা। এই মন্বন্তরে অবিভক্ত বাংলার ৩৫ লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যায়। অধ্যাপক প্রয়াত ক্ষিতীশ প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত বেসরকারি কমিশনের হিসাব অনুযায়ী মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ। বাংলার তৎকালীন অসামরিক সরবরাহ সচিব মিস্টার এইচ. এস. সুহারাবর্দি সাহেব পঞ্চাশের মন্বন্তরের জন্য বারোটি কারণকে দায়ী করেছিলেন। যেমন ১৯৪২ সালে আউশ আমন ধান উৎপাদনের ঘাটতি, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনার বন্যা, সরকারের নৌকো নিয়ন্ত্রণ নীতি, ব্রহ্মদেশ থেকে চালের আমদানি হ্রাস ইত্যাদি।[১] সরকারি অনুসন্ধানী দল ছাড়াও বিভিন্ন সময় একাধিক ঐতিহাসিক ও গবেষক পঞ্চাশের মন্বন্তর সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে আমেরিকার

গবেষক পল. আর গ্রিনো, ডেভিড আর্নল্ড, বি. এম ভাটিয়া, কালীচরণ ঘোষ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অমর্ত্য সেন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা তাদের গ্রন্থে এই মন্বন্তরের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের আয়নাতেও পঞ্চাশের মন্বন্তরের ছবি তুলে ধরার প্রয়াস করা হয়েছে। একাধিক সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক, কবি, লেখক তাঁদের সুনিপুন লেখনীর দ্বারা দুর্ভিক্ষের ইতিহাস সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে লেখা কয়েকটি সাহিত্যিক উপাদান হল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত' তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর', বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' গোপাল হালদারের ত্রয়ী উপন্যাস 'পঞ্চাশের পথ', 'ঊনপঞ্চাশ' ও 'তেরোশপঞ্চাশ', এছাড়াও এই পটভূমিতে সরোজ কুমার রায়চৌধুরী রচিত 'কালো ঘোড়া', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিন্তামণি' এবং অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'অকালের সন্ধানে' উল্লেখযোগ্য। একাধিক ছোট গল্প ও কবিতাতেও এই মন্বন্তরের ছবি দেখা যায় যেমন - বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভিড়', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কেরোসিন', সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা 'আকাল', সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতা থেকেও দুর্ভিক্ষ তাড়িত মানুষের কথা জানা যায়।[২] এই লেখায় কেবলমাত্র 'অশনি সংকেত', 'মন্বন্তর' ও 'নবান্ন' - এই তিন কালজয়ী রচনায় পঞ্চাশের মন্বন্তরের ইতিহাস কিভাবে তুলে ধরা হয়েছে, সেটাই সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা করব।

অশনি সংকেত : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়য়ে ১৩৫০ - এর মন্বন্তরের পটভূমিতে যে সমস্ত কালজয়ী উপন্যাস এবং নাটক রচিত হয়েছিল তার মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অশনি সংকেত ছিল অন্যতম। এতে দুর্ভিক্ষ পীড়িত গ্রাম বাংলার যে ভয়ংকর বাস্তবসম্মত ছবি তুলে ধরা হয়েছে অন্যান্য রচনায় তা বিরল দৃষ্ট। 'অশনি' শব্দের অর্থ হল বজ্র এবং 'সংকেত' শব্দের অর্থ হলও ইঙ্গিত, অর্থাৎ অশনি সংকেতের আভিধানিক অর্থ বজ্রের ইঙ্গিত। বিভূতিভূষণ গ্রন্থের নামটি এখানে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত-ভাবেই ব্যবহার করেছেন এখানে যুদ্ধের মহা বিপর্যয় মানুষের কাছে এসেছে বিধ্বংসী মন্বন্তরের রূপে। এই বিপর্যয় যুদ্ধ বা দুর্ভিক্ষ যার ফলেই ঘটুক না কেন তা প্রাকৃতিক নয়। মানুষের আগ্রাসী লোভের জন্যই তা সৃষ্ট হয়েছে। এক শ্রেণীর সাম্রাজ্য-লোভী পুঁজিবাদী সম্প্রদায় শান্ত নিরীহ দরিদ্র মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। অন্নাভাবের চেয়ে বড় অভাব মানুষের আর কিছু নেই। বিভূতিভূষণ সেই অভাবের এক মর্মস্পর্শী চিত্রকেই আলোচ্য উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে তুলে ধরেছেন।

উপন্যাসের প্রারম্ভিক বিভূতি সর্বনাশের ইঙ্গিত দিয়েছেন এইভাবে যে – 'ও বামুন দিদি ওঠো, কুমির এয়েছে নদীতে'।[৩] কিন্তু তত্ত্বদর্শী ছাড়া তাৎক্ষণিক এ ইঙ্গিত অজ্ঞাতই থেকে যায় গল্পের চরিত্র এবং সাধারণ পাঠকের কাছে। তাই দরিদ্র ব্রাহ্মণ গঙ্গা-চরণ বারবার বাসস্থান পরিবর্তন করতে করতে নতুন গাঁয়ে এসে স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে সংসার পাতে, অনঙ্গ বউ সেই সংসারকে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলে। গ্রামের মানুষ নিজেদের মতো করে একরকম সুখেই ছিল হঠাৎ কামদেবপুরে 'গাঁবন্ধ' করতে গিয়ে গঙ্গাচরণ প্রথম শুনলো চালের দাম খুব আক্রা হবে। গঙ্গাচরন যুদ্ধের কথা শুনেছিল এবং মাথার উপর দিয়ে দুই একটা এরোপ্লেন উড়ে যেতেও দেখেছিল, কাজেই শেয়ার অবিশ্বাস করতে পারল না। বিভূতিভূষণ লিখেছেন, 'বৈশাখের মাঝামাঝি বাজারের আরও পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল, চালের সঙ্গে কেরোসিন আর মেলেনা, নুনেরও অভাব হতে পারে, মানুষ এই প্রথম দেখলো পয়সা থাকলেও জিনিস জোটে না'।[৪] বৈশাখ বলতে এখানে ১৩৫০ সালের বৈশাখ ও ইংরেজি ১৯৪৩ সালের এপ্রিল - মে মাসকে বোঝানো হয়েছে। ঐতিহাসিকরাও এই মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়কালকে এই মন্বন্তরের চরম অবস্থা বুঝিয়েছেন। এই খাদ্যাভাবের কথা বলতে গিয়ে বিভূতিভূষণ কিন্তু কোথাও বলেননি যে অজন্মার জন্য খাদ্যশস্যের অভাব ঘটেছে। তিনি জানিয়েছেন অভাবের বিভিন্ন

কারণ এর মধ্যে একটি কারণ হলো কালোবাজারি মার্কেটের ফলে বেশি দাম পেয়ে চাষী মজুদ ধান বিক্রি করে দিয়েছিল। গঙ্গাচরণ দেখল, 'যে বাঁশের মাচায় চালের বস্তা ছাদ পর্যন্ত সাজানো থাকে সে জায়গায় একদম খালি হাওয়া খেলছে'।[৫] শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি চালের অভাব তীব্র হয়ে উঠল, শেষের দিকে চাল যেন কর্পূরের মত উবে গেল, এর ওপর শুরু হল ত্রিপুরা থেকে আগত জীর্ণশীর্ণ, কঙ্কালসার উদ্বাস্তু ভিখিরির ভিড়। তারা 'ফ্যান খাইতাম ফ্যান খাইতাম'[৬] বলে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ফ্যান চেয়ে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু চাল নেই তো ফ্যান কিভাবে মিলবে! লোকে চালের অভাবে কচুর ডাঁটা, গাছের শাক পাতা, পুকুরের গেঁড়ি- গুগলি খেতে লাগলো। মতি মুচিনীর মৃত্যু গ্রামের প্রথম অনাহারে মৃত্যু। তার মৃত্যুতে গ্রামের অন্যান্য লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। অচ্ছুৎ বলে উচ্চবর্ণের মানুষরা কেউ তার দেহ ছুঁতে চাইলো না, শেষ পর্যন্ত অনঙ্গের অনুরোধে কাপালি বউ, দুর্গা ভট্টাচার্য ও গঙ্গাচরণ হাত লাগায়। শুদ্রের শব ব্রাহ্মণ শুদ্র সবাই মিলে বহন করে। মৃত্যু এসে উচ্চ-নিচ সব সমান করে দিল, মন্বন্তর ঘটায় কালান্তর বা মানুষের নব জন্মান্তর।

'অশনি সংকেত' উপন্যাসের গ্রামীণ জীবনালেখ্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অদ্ভুত সাবলীল ও প্রাণবন্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ পত্নী বিজয়া রায়ের উক্তি স্মরণীয়, উনি (সত্যজিৎ রায়) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত' করেছেন। বইটা পড়ে অবধি, ওর মন ভরে গিয়েছিল, বলেছেন 'এত সুন্দর একটা ছবি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এর মধ্যে' তাছাড়া বিভূতি বাবুর বই থেকে ছবি করতে ওকে অনেক কম খাটতে হত। কারণ কথা অর্থাৎ ডায়লগ প্রায় বদলাতেই হত না। দৃশ্যের পর দৃশ্য এমনভাবে লেখা, মনে হয় যেন ছবির জন্যই লেখক লিখেছেন। ছবিটাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পেতেন।[৭] বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসকে শুধুমাত্র বিষাদ এবং হতাশা দিয়েই শেষ করেননি, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করার পথনির্দেশ তিনি রেখে গেছেন। গঙ্গা চরণের কাঙ্ক্ষিত জমিতে অনঙ্গ-এর সংগৃহীত বীজ বপন করলেই ফলবে সোনার ফসল, শুরু হবে নবান্নের উৎসব। তাই পরিশেষে মনে হয় শুধুমাত্র নবান্নের উৎসব, শুধুমাত্র মন্বন্তর কবলিত গ্রাম বাংলার ঐতিহাসিক চিত্র রচনায় নয়, ভূমিহীন মানুষের ভূমি লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং কৃষি ক্ষেত্রে সকল শ্রেণীর মানুষকে শ্রমদানের সোচ্চার আহ্বান 'অশনি সংকেত'কে এক অন্য মাত্রা দান করেছে।

মন্বন্তর: ১৩৫০ এর ভয়াবহ মন্বন্তরকে উপজীব্য করে রচিত অপর একটি বিখ্যাত উপন্যাস হল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় অপরিসীম মূল্যবৃদ্ধি, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনের সমস্যা ও সংকট, পুরনো মূল্যবোধের দ্রুত অবলুপ্তি, নৈতিকতার অবক্ষয়, হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা এক সম্প্রদায়ের নীতিহীন বিবেক বর্জিত পন্থা - এই সর্বাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে পঞ্চাশের মন্বন্তরের ছবি নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। তবে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতার সঙ্গে শেষ হয়নি উপন্যাসের কাহিনী, এক বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমকালীন কলকাতার নাগরিক জীবনকে তুলে ধরেছেন লেখক। উপন্যাসের ভূমিকায় তাই লিখেছেন দেশের বর্তমান অবস্থার পটভূমিতে বাঙালির এ যুগের আদর্শে অনুপ্রাণিত ছেলে মেয়েদের জীবন নিয়ে বই লিখবার কল্পনা আমার ছিল। অভিজাত পরিবারের সন্তান কানাই এবং কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী নীলা ও নেপীর দুর্ভিক্ষ ত্রাণে যোগদান উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। উপন্যাসের শেষে কমরেড এর হাতে হাত মিলিয়ে নায়ক কানাই কে বলতে শোনা যায় – 'মানুষকে এই মন্বন্তরের দুর্যোগ পার করে নিয়ে যেতে হবে'।[৮]

'মন্বন্তর' উপন্যাসের সূচনাতেই ধনী ও অভিজাত সুখময় চক্রবর্তীর বংশানুক্রমিক রোগ জীর্ণতা এবং ফলস্বরূপ প্রানশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসার কথা বলা হয়েছে প্রথম পর্বে। তিনি নিজেই বলেছেন- 'পচনশীল বিলাসীর

গৃহের পতন তার বিষয় বস্তু।[৯] 'তবে শুধু পচনশীল বিলাসের গৃহের পতনই নয়, দুর্ভিক্ষ মহাযুদ্ধ ও গান্ধীজীর অনশনের পটভূমিকায় বিত্তের মানদণ্ডে বিভাজিত সমাজের পাঁচটি পরিবারের কাহিনী সুগ্রথিত হয়ে উপন্যাসটির কায়াসৃজন করেছে। যথা- ক. পড়তি অভিজাত সুখময় চক্রবর্তীর পরিবারের ইতিবৃত্ত। খ. কমিউনিস্ট কর্মী নিলা, নেপী এবং তাদের বাবা দেবপ্রসাদ সেনের আদর্শ ও সাংসারিক কাহিনী। গ. গীতার বাবা শহরতলীর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রধান পল্লীর অধঃপতিত সন্তান প্রদ্যত ভট্টাচার্য ও তার স্ত্রী সরোজিনীর জীবন পরিনিতি। ঘ. হটাৎ ধনী কালোবাজারি বি. মুখার্জী ও তার ছেলে অমলের নীতিনতার কাহিনী। ঙ. অসহায় গুনদা বাবু ও তার স্ত্রীর জীবন কাহিনী। যুদ্ধের অভিঘাতে বাংলায় যে বিপদজনক অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া ঘটে ঔপন্যাসিকের কলমে তা চিত্রিত হয়েছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছদে দেখানো হয়েছে ব্রহ্মদেশ জাপানিদের হাতে, ওখানকার কেরোসিনের উৎসমুখ এদেশের পক্ষে বন্ধ, ময়দা ও অমিল হয়ে আসছে। রোজ দাম বেড়ে চলেছে দু-আনা, তিন-আনা, চার-পাঁচ-ছয় আনা প্রায় লাফে লাফে।[১০] উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখা যায় আমেরিকান মিলিটারি লরি সারিবদ্ধ ভাবে চলছে আর সামনেই একটা কন্ট্রোলের দোকানে অস্বাভাবিক রকমের লম্বা কিউ দাঁড়িয়ে গেছে, মেয়েদের কিউ। হিন্দু মুসলমান, হিন্দুস্থানী বাঙালি-স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ঝিয়ের দল। গৃহস্থ ঘরের বিধবা-সধবা- কুমারী শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে...। ভিক্ষা ওদের পেশা নয় কিন্তু ওরা আজ ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছে।[১১] এই ভীষণ বিপর্যয়ে ধর্ম জাতির বেড়াজাল অতিক্রম করে একটাই সমতলে এসে দাঁড়িয়েছে মানুষ। এই চরম দুর্গতি তাদের আবরণ থেকে মুক্তি দিয়েছে। এভাবেই সমকালীন বীভৎসতাকে চিত্রিত করেছেন তারাশঙ্কর। এরই সঙ্গে আছে চট্টগ্রামের উপর বিমান হানার খবর। ২রা মার্চ ১৯৪৩ মহাত্মা গান্ধীর অনশনের ২১ দিন তথা শেষ দিন পর্যন্ত উপন্যাসের বিস্তৃতি পর্ব।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মন্বন্তর' সমকালীন বাংলার ইতিহাস ও রাজনীতির অন্যতম দলিলচিত্র। বিশিষ্ট সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন – 'লেখক দৈনিক সংবাদপত্র হইতে সংবাদ সংকলনে অতিমাত্রায় ব্যাগ্র হইয়া এই চমৎকার ঔপন্যাসিক সম্ভাবনাটির অকাল মৃত্যু ঘটায়াছেন'।[১২] তবে সমালোচকের এই অভিমত সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা মন্বন্তরের খুব সামান্য অংশই সংবাদপত্রের সংকলন। আর সংবাদপত্রের যেসব সংবাদের মাধ্যমে যুদ্ধের অবস্থা বা দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা প্রকাশিত সেগুলিকে ঐতিহাসিক দলিল হিসেবেও গ্রহণ করা যায়। বরং বলা যায়, সমসাময়িক পরিস্থিতিকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে উপস্থাপনের জন্য সংবাদপত্রের মাধ্যম গ্রহণ উপন্যাসটির শৈলীকে অভিনবত্ব দিয়েছে।।

নবান্ন : মন্বন্তর ও যুদ্ধের অভিঘাতে বিপর্যস্ত ও ঔপনিবেশিক ভারতের দুর্দশা দেখে সংগ্রামী, মানবিক প্রত্যয়বান শিল্পী বিজন ভট্টাচার্য গণনাট্য সংঘের সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হন ও দুর্ভিক্ষগ্রস্থ মানুষের মর্মান্তিক আর্তনাদকে নাট্যরূপ দেন। বিজন ভট্টাচার্যের ও শম্ভু মিত্রের যৌথ পরিচালনায় 'নবান্ন' প্রথম মঞ্চস্থ হয়। সাম্রাজ্যবাদের নির্মম শোষণের বিরুদ্ধে আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিতে গ্রামের সম্পন কিংবা সাধারণ গৃহস্থের বেদনাময় যাত্রা ও সজ্ঘবদ্ধ শক্তিতে প্রত্যাবর্তনের নাটক নবান্ন।[১৩]

নবান্ন নাটকে ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে কৃষক জীবনের দুর্দশা গ্রস্ত ছবি অঙ্কিত হয়েছে। এই নাটকে আমিনপুর গ্রামের বর্ধিষ্ণু চাষি প্রধান সমাদ্দারের পরিবার, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে কবলিত তার দুই পুত্র কিভাবে দুর্ভিদের সাথে লড়াই করছে তাই তুলে ধরা হয়েছে। মন্বন্তরের ফলে সম্পন্ন চাষী গৃহস্থের বিপর্যয়ের কাহিনী অন্য সব চাষী জীবনের সাথে একাকার হয়ে যায়, পশুর আহারে দিনযাপন, চারিদিকে মৃত্যুর সমারাহো, পারিবারিক সামাজিক মূল্যবোধ বিসর্জন

দিয়ে শহরে আগমন, শহরবাসীদের হৃদয়হীনতা এবং শেষে বেদনার অভিজ্ঞতা নিয়ে গ্রামবাসীর নিজ গ্রামে ফেরা একের পর এক ঘটনা নাটকের প্রথম তিনটি দৃশ্য জুড়ে চলতে থাকে। আমিনপুর গ্রামের অনাহারে পীড়িত অগণিত দীনহীন মানুষ যারা জীর্ণ বসনে, দুর্বল দেহে, মেঠো গন্ধ গায়ে মেখে ঘুরে বেড়ায় রাস্তায় রাস্তায়, নান্দনিক শিল্পবোধ অপেক্ষা সমাজ সত্যের বার্তাকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা দেখা যায় এই নাটকে। নাটকে রাজা নেই, রানি নেই আর্কল্যাম্পের বিশেষ ফোকাসের আকর্ষণ নেই, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের শুভকামনা, শম্ভু মিত্রের অসামান্য মঞ্চ কৌশল, বিজন ভট্টাচার্য ও গঙ্গা পদ বসুর অভিনয় নির্দেশ নামায় নবান্ন সৃষ্টি করেছিল নতুন ইতিহাস।[১৪]

প্রখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এই নাটক সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানান- 'এই মন্বন্তরের জন্য দায়-দায়িত্ব চিরাচরিত প্রথায় অন্ধের মত অসহায় ভাবে বেচারা ভগবানের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। বাংলায় সাহিত্য জীবনে এটি নব ভাবোপলব্ধির একটি স্পষ্ট ইঙ্গিত'।[১৫] সবশেষে বলা যায় ভারতীয় নাটকের ক্ষেত্রে 'নবান্ন' যুগান্তর ঘটায়। অভিনয়ের ষ্টার প্রথার অবসান ঘটিয়ে পেশাদারী থিয়েটার প্রচলিত বিনোদনের ঐতিহ্যের বেড়া ভাষ্যমঞ্চে মন্বন্তর পীড়িত কৃষিজীবীদের প্রকৃত চিত্র উদঘাটন করে নবান্ন যথার্থ বিপ্লব ঘটাতে পেরেছিল।[১৬]

Reference :

১. মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ; 'পঞ্চাশের মন্বন্তর', কলকাতা, ১৯৪৩, পৃ-৩-৪
২. ভট্টাচার্য, সুকান্ত; 'সুকান্ত সমগ্র', কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ২১
৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, 'অশনি সংকেত', পঞ্চম মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ১৪১২ (প্রথম সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৯৮) পৃ. ৩
৪. ঐ. পৃ. ২৫
৫. ঐ. পৃ. ৩৩
৬. ঐ. পৃ. ৪৩
৭. রায়, বিজয়া; 'আমাদের কথা', দেশ, কলকাতা, ১৭ মার্চ, ২০০৪, পৃ. ৩২
৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর; 'তারাশঙ্কর রচনাবলী', পঞ্চম খন্ড, প্রথম সংস্করণ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৩২
৯. ভট্টাচার্য, জগদীশ; 'তারাশঙ্কর রচনাবলী', পঞ্চম খন্ড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা ১৩৮০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯০
১০. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর; 'তারাশঙ্কর রচনাবলী', পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৫৫
১১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩৮
১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার; 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৫৬
১৩. চক্রবর্তী, সুপ্রভাত; 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন বাংলা নাটক ও নাট্যশালা', কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৯৭
১৪. চন্দ্র, দীপক; 'বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা', কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১৬৮
১৫. দত্ত, সুনীল; 'নাট্য আন্দোলনের ত্রিশ বছর', জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ১২
১৬. দশ, ধনঞ্জয়; (সম্পা:), 'বাংলা সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা', কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৫০৯-১০